:: প্রথম অধ্যায় ::

প্রথম অধ্যায়

॥ বলাকা পর্বের প্রবেশক ॥

দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ের রবীন্দ্র কবিতার সমাজ সম্পর্কের ধারার পর্যালোচনা 'বলাকা'থেকেই শুরু হওয়া সঙ্গত । কারণ প্রথম মহাযুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে আরো কিছু কিছু ঘটনার সূত্রে বলাকার কবিতাতেই সমাজ সম্পর্কের পরিবর্তিত রূপ লক্ষ্য করা যায় । মূল আলোচনা সেখান থেকে শুরু হলেও রবীন্দ্র কবিতায় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক রচনায় সমাজ সম্পর্কের ধারা প্রায় প্রথম থেকেই ধরা পড়েছে । মূল আলোচনার পটভূমি হিসেবে সেই প্রসঙ্গও আলোচিত হওয়া প্রয়োজন আর বর্তমান অধ্যায়ে তারই প্রয়াস ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে বলেছেন — 'আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে । 'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবন নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান । সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার । —

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ।
বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের এই আত্মনিবেদন ।' [১]

'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত' 'ছবি ও গানে'র স্তর পার হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলে' অনিঃশেষ জীবনকোরকের ঘ্রাণ নিলেন । যে জীবনের স্বাদ নিলেন, সে জীবন বিশ্বের জীবন — মানব সমাজের সঙ্গে তার ওতপ্রোত সম্বন্ধ । সংসার সমাজের বিচিত্র ঘাত - প্রতিঘাতে জীবন কাতর হয়, আবার নতুনতর আশার

১। জীবনস্মৃতি, বর্ষা ও শরৎ, রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ... ১২২

প্রতীক্ষায় আগামী সম্ভাবনাকেও দেখে । সমাজের নানাবিধ চিন্তাচেতনা রবীন্দ্রনাথের মনকেও নাড়া দেয় তার কবিতায় তার সম্পর্কসূত্রও আভাসিত হ'য়ে ওঠে । জীবনযাত্রায় যোগ দিতে আগ্রহী কবি নিজেই নিজের কাব্যরচনা সম্পর্কে জীবনস্মৃতির পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই বলেন , '... আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ । তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী । কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রং নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে । এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে ।

এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল । জীবনে এখন ঘরের ও পরের , অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে । এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে - সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে দিয়া উত্তীর্ণ হইবে , তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না । এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয় , কত সংঘাত ও সম্মিলন ।' এ দেখাই কবির কাছে হয়ে উঠলো প্রিয় উপলব্ধি ।

'জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ , সেই মোহেই আমার মুক্তি রসের আস্বাদন ।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ।
অসংখ্যবন্ধন - মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ । এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণ গন্ধময় ।' [২]

২। আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ পৃষ্ঠা ... ১৭৮

সতের বছর বয়সে দাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে, ২০ সেপ্টেম্বর প্রথম বিলেত গেলেন রবীন্দ্রনাথ। মেজদাদার সঙ্গেই দ্বিতীয়বার বিলেতে গেলেন কবি ২২ আগস্ট, ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে। এই দ্বিতীয়বার বিলেতে গিয়ে ভালো লাগলো না কবির। তৃতীয়বার বিলেতে গেলেন ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে। এবার যাত্রা করবার আগে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে লেখেন (২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮) –

'.... আত্মীয় স্বজন ঘর দুয়ার ও স্বদেশ সমাজের লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্ম অভ্যাসের জাল কাটিয়া একবার সমস্ত মানুষের দলে আপনাকে ভর্তি করিয়া লইতে চাই। তাহা হইলেই বলিতে পারিব মানুষের পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম ও মানুষের পৃথিবী হইতে বিদায় লইলাম। আমি বাঙালী হইয়া ঠাকুরবাড়ীতে জন্মিয়াছি এই ত আমার শেষ পরিচয় নহে।'[৩]

যে মানুষের মাঝে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে চেয়েছেন 'কড়ি ও কোমল' রচনার পর্ব থেকেই সেই মানব ও তার সমাজ - সংসার দেশকালের আবহাওয়া, তৎ - কালীন রাজনীতি এ সবের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবেই যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিলেত ভ্রমণ শেষ করে কবি ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে ফিরলেন দেশে। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে 'ইলবার্ট বিলে'র সপক্ষে ও সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল উত্তেজনা ভারতে বিক্ষোভ জাগিয়ে তুললো। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে 'ইলবার্ট' বিল পাশ হ'লো। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল কনফারেন্সের' অধিবেশন বসেছিল কলকাতায় ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে। সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল এই সময়ে 'ভারতী'তে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে।[৪]

* *

৩। চিঠিপত্র, সপ্তম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা ৫০

৪। 'চেঁচিয়ে বলা', (ভারতী, চৈত্র, ১২৮৯), 'জিহ্বার আস্ফালন', (ভারতী, শ্রাবণ, ১২৯০), 'ন্যাশনাল ফাণ্ড' (ভারতী, কার্ত্তিক, ১২৯০), 'টৌনহলের তামাশা' (ভারতী, পৌষ, ১২৯০), 'অকাল কুষ্মাণ্ড' (ভারতী, চৈত্র, ১২৯০)

১২৯১ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'হাতে কলমে' প্রবন্ধে "আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরেজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে " এবং ''স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে" এইরকম সুদিনের প্রত্যাশা জানিয়ে ভারতীতে প্রকাশিত 'হাতে কলমে' (আশ্বিন, ১২৯১) প্রবন্ধে লিখলেন – 'এই যে শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা, এ জিহ্বার ব্যায়াম শিক্ষা নহে, ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা।"

ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে যখন বাংলার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্মিলিত হ'লো তখন "বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দিকে এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল" লক্ষ করে সোলাপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "আজ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যে নব-জাতির জন্মসঙ্গীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে পশ্চিমঘাট গিরির সীমান্তদেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি।" 'জিহ্বার ব্যায়াম' বা 'কৌতুহলের তামাশা' আজ ভিন্ন তাৎপর্যে দেখা দিল। কবি তা স্বীকার করে লিখলেন,– "বঙ্গদেশের মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবলমাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি।" [৫]

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউমের প্রেরণায় ও নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জন্ম নিলো। বোম্বাই শহরে হ'লো এর প্রথম অধিবেশন আর সভাপতি হলেন সেখানে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য যে কলকাতায় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই নব প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের যে দ্বিতীয় অধিবেশন হ'লো সেখানে রবীন্দ্রনাথও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যে গান গেয়ে শোনান তাঁর রচিত সেই গানের কথায় – "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে ? । ... মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে। সেই নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে

* *

৫। চিঠিপত্র, শ্রীচরণেষু, 'বালক', ১২৯২, পৌষ।

ভাইকে দেখে ॥" সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়। বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মাত্র তিনজন বাঙালীর উপস্থিতি, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে বাইরে রেখে কংগ্রেস গঠনের প্রয়াসের ভেতর দিয়ে যে বিচ্ছেদচেতনা প্রকাশিত কবির তা মনঃপূত ছিলো না।

বাইরের দিক থেকে দেখলে বিদেশী প্রথার চলন ঠাকুরপরিবারে গোড়া থেকেই ছিলো। কিন্তু গোটা পরিবারের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ছিল স্বদেশাভিমান। এই ঠাকুর পরিবারের সাহায্যেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিলো হিন্দুমেলা।[৬] রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন এইভাবে "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কর্জনের সময় দিল্লী দরবার সম্বন্ধে একটা গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি, লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে — তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট রুশিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না।"[৭] হিন্দুমেলা ছাড়াও 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সংগঠনও গড়ে উঠেছিলো রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে। জন্মমুহূর্ত থেকে কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। তিলকের আবির্ভাবে অবশ্য কিছুটা অবস্থান্তর ঘটে।

****

৬। জাতীয় মেলার (হিন্দু মেলা) প্রথম অধিবেশন হয় বেলগাছিয়াস্থ জানকিন সাহেবের উদ্যানে সন ১২৭৩ সালের ৩১শে চৈত্র অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে (১৮৬৭ খ্রী: ১২ই এপ্রিল), সম্পাদক ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র, হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত : যোগেশ চন্দ্র বাগল, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃষ্ঠা - ৫

৭। জীবনস্মৃতি, স্বাদেশিকতা, রবীন্দ্ররচনাবলী, দশমখণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ: ... ৬৬ - ৬৭

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জুলাই তারিখে লেখা মি. ডাবলিউ বোলটনের (তদানীন্তন বাংলা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী) পত্রে উধৃত কংগ্রেস সমর্থকদের তালিকায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের সবাইকে সক্রিয় কংগ্রেস সমর্থকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে । [৮] রবীন্দ্রনাথও তখন সক্রিয় কংগ্রেস সমর্থক । "কংগ্রেস বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না ।" – 'মন্ত্রী অভিষেক' প্রবন্ধে একথা তিনি ঘোষনা করেন । আবার কংগ্রেসের ঐকান্তিক আবেদন নিবেদনের রাজনীতিতেও অখুশি তিনি । "আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির" নেতৃবৃন্দের কর্মপ্রণালীতে পরিপূর্ণ সমর্থনে তাঁর দ্বিধা প্রকটিত হয়েছে ইস্টার উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সম্মিলনীতে গীত (১০ এপ্রিল, ১৮৮৭) "তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ" এই গানের ভাষায় । সেদিনের রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয় চেতনার প্রমাণ রয়েছে এই পর্বে রচিত দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যাকে ঘিরে লেখা তাঁর প্রবন্ধাবলীতে । [৯] অপরদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে "শুধু মিছে কথা ছলনা" কথা শেঁখে শেঁখে শুধু করতালি অর্জন আর "মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে মিছে কাজে নিশিযাপনা"য় তাঁর অনাগ্রহ । পরিবর্তে আত্মশক্তির উদ্বোধন, অভ্যন্তরীণ সংহতিবোধের যে আবেগ তাঁর অন্তরে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিলো তার প্রকাশ ঘটেছে 'কড়ি ও কোমলে'র 'বঙ্গভূমির প্রতি', 'বঙ্গবাসীর প্রতি' 'আত্মত্রাণ' প্রভৃতি কবিতায় । ঈষৎ ব্যঙ্গের ধাঁচে লেখা মানসীর 'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি' 'বঙ্গবীর' প্রভৃতি কবিতাও এ প্রসঙ্গে স্মরনীয় । "স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধন", "আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য – ইহা ভারত ভূমির জন্য,

* *

৮। " The members of the branch of the family of which Babu Debendra Nath Tagore is the head, are active Congress men " – Hamilton Papers, India Office Library quoted in The Evolution of India and Pakistan 1858 – 1947 : C.H.Philips; O.U.P. 1965, Page – 150.

৯। 'ইংরেজের আতঙ্ক' (সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩০০), অপমানের প্রতিকার (সাধনা, ভাদ্র, ১৩০১), 'রাজা ও প্রজা' (সাধনা, শ্রাবণ, ১৩০১) প্রভৃতি প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ।

ইহার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর।"— এই আত্মনির্ভর স্বদেশ সাধনের যে আদর্শ হিন্দুমেলায় অনুসৃত রবীন্দ্রনাথের চেতনায় তা মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে এর সময়োপযোগী রবীন্দ্রানুগ রূপ পরিলক্ষিত হবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তায়।

যখন 'অত্যাচারে মত্ত - পারা' সেই সন্ধিক্ষণে 'কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে পোলিটিক্যাল তর্ক'র বাগাড়ম্বরে বীতস্পৃহ কবি 'দুরন্ত আশা'তে লিখেছিলেন "মেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে। মিষ্ট হাসি টানি। বলিতে আমি পারিব না তো। ভদ্রতার বাণী।" নিজের অনুভূতিটাকেই প্রখর আকারে পেশ করেছিলেন — "অত্যাচারে মত্ত - পারা। কভু কি হও আত্মহারা ? । তপ্ত হয়ে রক্তধারা। ফুটে কি দেহমাঝে ? অহর্নিশি হেলার হাসি। তীব্র অপমান মর্মতলে বিদ্ধ করি। বজ্রসম বাজে।" শাসককুলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিলকের প্রতিবাদ, তাঁর কারাবাস, নাটুভ্রাতৃদ্বয়ের নির্মম পরিণতি রবীন্দ্রনাথকে উদ্দীপিত করেছিলো। মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা ও অবমাননায় তাঁর যে ক্ষোভ তা আরো তীব্র হ'য়ে ওঠে সিডিশান বিল প্রস্তাবিত হতে দেখে। 'কণ্ঠরোধ'[১০] প্রবন্ধে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের অপপ্রয়াসকে ধিক্কার দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "দুইশত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানব সম্বন্ধের এই কি অবশেষ ?" তিলকের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ যে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দীপ্ত করেছিলো তার আরো প্রমাণ তিলক প্রবর্তিত শিবাজী উৎসবের ঢেউ বাংলার তটে এসে আঘাত হানলে সখারাম গণেশ দেউস্করের 'শিবাজীর দীক্ষা' বইয়ের ভূমিকার জন্য কবি লিখে দেন 'শিবাজী উৎসব'। মনুষ্যত্বের অবমাননার ও আত্ম অসম্মানের আর এক ছবি এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মেঘ ও রৌদ্র' এবং 'রাজটীকা' গল্প দুটিতে। অতঃপর আত্মনির্ভরতায় প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে প্রায় সমসময়ে লেখা কল্পনার 'বর্ষশেষ', 'শরৎ', 'মাতার আহ্বান' 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' 'হতভাগ্যের গান' প্রভৃতি কবিতায়। দেশবাসীকে এই আত্মনির্ভরতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে 'স্বদেশী ভাণ্ডারে' দেশী বস্ত্রের বিপণি

১০। সাধনা, বৈশাখ, ১৩০৫।

খুলে বসলেন রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'স্বদেশী সমাজ' (১৩০৮ - ১২ সাল) প্রবন্ধ, প্রতিষ্ঠা করলেন শান্তিনিকেতন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে।

ধর্ম সম্পর্কে গোঁড়ামি ও স্বাদেশিক সংকীর্ণতাকে অনেকখানিই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলেতে ভ্রমণ করে। ১৮৮৫ - ১৮৮৬ এই সময় থেকেই ব্রাহ্মসমাজের সপক্ষে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লেখনী তুলে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নব্যহিন্দুয়ানীকে আঘাতই করলেন তিনি। এই উদ্দেশ্যেই প্রিয়নাথ সেনকে লেখা 'দামু ও চামু' [১১] কবিতাপত্রটি রচিত হ'য়েছিলো। 'আর্য ও অনার্য' [১২] এই শ্রেণীরই হেঁয়ালি নাট্যপ্রয়াস। এই আর্য ধর্ম সম্পর্কে যেমন হেঁয়ালী লক্ষ্য করা গেল তেমনি এখানে ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা সম্পর্কে সচেতন রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য :— "ব্রাহ্মসমাজকে, তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব - ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।" কেননা "বর্তমান কালের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীনকালের বিশ্ব পৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্ব পৃথিবীর পক্ষে এখনও এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে।" [১৩] পরবর্তীকালে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে যে 'গোরা' উপন্যাস লেখা হ'লো তাতে দেখা যায় ব্রাহ্মধর্মের সম্প্রদায়গত গণ্ডী-ও রবীন্দ্রনাথ ভেঙে ফেললেন এবং ধর্ম নিরপেক্ষ এক উদারতর সর্বমানবিক ভাবনায় ভাবিত হ'লেন।

দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রায় (১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে) ইংলণ্ডকে রবীন্দ্র-নাথের ভালো লাগেনি, কেননা, সেখানে তিনি সাম্রাজ্যবাদী উগ্রলালসা দেখতে

****

১১। 'দামু ও চামু' — কবিতাপত্র, ভারতী, ১২৯২, ফাল্গুন,

১২। 'আর্য ও অনার্য' — রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা — ১১৯ - ২২,

১৩। ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা — শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ: - ৪০৯

দেখতে পেয়েছিলেন । অবশ্য সেখানকার সমাজজীবনের প্রগতিশীল ভাবনাগুলো যেমন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য , নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি এবং লক্ষ করা যায় যে এই দেখারই ফলশ্রুতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের দেশের স্ত্রী লোকদের অবস্থা সম্পর্কে গভীরতর চিন্তায় নিমগ্ন হ'লেন । স্ত্রী - শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করলেন কবি 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধে এ ছাড়া 'স্ত্রী মজুর' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে তাতে স্ত্রী মজুরদের সমস্যা ও তাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করানো ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলেছেন । [১৪] প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির দিকগুলি রবীন্দ্রনাথের নিকট সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিলো । শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই তাঁর শিক্ষাচিন্তার সারকথা । মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পরামর্শ এবং তৎসহ তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল কথাগুলি তিনি নিবেদন করেন রাজশাহী এসোসিয়েশনে পঠিত তাঁর বিখ্যাত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে । ১২৯৯ - এর পৌষ সংখ্যা সাধনায় প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ।

জমিদারী দেখাশুনোর সূত্রে শিলাইদহে বাস রবীন্দ্রজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । বাংলার গ্রামীন অতি সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে এই সময় রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'লো আর এই পরিচিতি রবীন্দ্রসাহিত্যকে নানা-ভাবে সমৃদ্ধ করেছে । কবি এদেরই কথা 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় বলেছেন । একদিকে রোমান্টিক কবি-কল্পনা ও অন্যদিকে বাস্তবের প্রতি আকর্ষণ — রবীন্দ্র কবিতার এই দুটো দিকই উক্ত কবিতাটিতে ধরা পড়েছে । তবে তুলনায় মর্তের প্রতিই, মানুষের প্রতিই আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখা যায় বাংলায় তা চরম রূপ ধারণ করলো ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ

* *

১৪। নেপাল মজুমদার মন্তব্য করেছেন, — 'খুব সম্ভবত স্ত্রী মজুরদের পক্ষ লইয়া কিংবা ইহার বিভিন্ন সমস্যা লইয়া ইতিপূর্বে এদেশে কেহ আলোচনা করেন নাই ।' —'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ : নেপাল মজুমদার, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬১, পৃঃ - ৭২ ।

আন্দোলনের ভেতর দিয়ে । বাংলাদেশ যেদিন বিভক্ত হবার কথা সেদিন ১৯০৫, ১৬ অক্টোবর, সারা বাংলায় রাখীবন্ধনের আয়োজনে দেশবাসীর পুরোভাগে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের উৎসাহিত করে তুললেন রবীন্দ্রনাথ । কবির লেখা –

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান ।

এই প্রার্থনায় বাংলার আকাশ মুখরিত হ'লো । বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে সাহিত্যের ফসল দেখা দিল এই আবেগে রবীন্দ্র রচিত অজস্র স্বদেশী সঙ্গীতে । ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধলো , ডিসেম্বর মাসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলো । ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলো । ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন, আর আগস্ট মাসে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হ'লো । এই সমস্ত ঘটনায় ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ দেশকে কর্মের পথে আহ্বান জানিয়ে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' [১৫] প্রবন্ধ লিখলেন । তাতে বললেন, "কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে খুবই একটা নাড়া পাইয়াছে । এইবার প্রথম দেশের লোক একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে । সেটা এই যে, আমরা যতই গভীররূপে বেদনা পাই না কেন, সে বেদনার বেগ আমাদের গবর্মেন্টের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারেনা । গবর্মেন্ট্ আমাদের হইতে যে কতদূর পর তাহা আমাদের দেশের সর্বসাধারণ ইতিপূর্বে এমন স্পষ্ট করিয়া কোনদিন বুঝিতে পারে নাই ।"

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দ ঘোষের একটি প্রবন্ধ

১৫। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' – রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড , জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ পৃষ্ঠা ... ৯০৫

রাজরোষে পড়লেন তাঁর বিচার চললো আদালতে । উৎকণ্ঠিত হ'লো বাংলা । রবীন্দ্র-নাথ সেই সময়ে একদিকে অরবিন্দকে শ্রদ্ধা, অন্যদিকে স্বদেশপ্রেমিক যুবশক্তিকে উৎসাহিত করে লিখলেন 'নমস্কার' [১৬] কবিতাটি । উদ্ধৃতি তুলে দেখা যেতে পারে কবির বক্তব্য কী –

...' শাস্তি ? শাস্তি তারি তরে/যে পারে না শাস্তি ভয়ে হইতে বাহির/লঙিঘয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর –/কপট বেষ্টন, যে নপুংস কোনোদিন/চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন/অন্যায়েরে বলে নি অন্যায় , আপনার/মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য - অধিকার/যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার/সভা - মাঝে, দুর্গতির করে অহংকার ,/দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়/অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত - প্রায় –/সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তিভারে/রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে ॥/'

এই ধরণের চরিত্র কবির চোখে অবজ্ঞার পাত্র । কবি অরবিন্দ ও স্বদেশী যে সমস্ত যুবকদের উৎসাহ দিতে চেয়েছেন তাঁরা এর উলটো পিঠ – রবীন্দ্র-নাথের শ্রদ্ধার পাত্র । তাই অরবিন্দকে সরাসরি নমস্কার জানিয়ে কবিতাতেই কবি বলেছেন, "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার ।" দেশের সন্ত্রাসবাদীদের কাজকর্ম গতি-বিধি ঠিক সমর্থন করেন নি কবি, তবু এও দেখা যায় যে এই যুবকদের মধ্যে যে সংগ্রামশীল মৃত্যুঞ্জয়ী দুঃসাহস আছে তাকে বন্দনা করেছেন । উক্ত উদ্ধৃতি থেকেও সে কথা বোঝা যায় । ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দেই রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ রচিত হ'লো । যেমন – 'যজ্ঞ ভঙ্গ', 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা ও সদুপায়' , 'স্বদেশ', 'সমাজ' ইত্যাদি । কংগ্রেসের দুই দল – মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীর নিজেদের মধ্যেকার ঝগড়া-বিবাদ দেশহিতের চাইতেও বড় হ'য়ে ওঠায় রবীন্দ্রনাথ বেশ ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছেন এবং তারই প্রকাশ ঘটেছে 'যজ্ঞভঙ্গ' প্রবন্ধটিতে । সেখানে কবি বলেছেন, –

* *

১৬। 'নমস্কার'– (৭ ভাদ্র, ১৩১৪) রবীন্দ্র রচনাবলী , তৃতীয় খণ্ড, জন্মশত-বার্ষিক সংস্করণ , পৃষ্ঠা .. ৯২৩

"মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কন্‌গ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকিতেন — দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইঁহারা নিজের শক্তিকে নানাপথে অহরহ একাগ্র মনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন, তাহা হইলে কন্‌গ্রেস সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না।"[১৭] রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধটির মধ্যেও ব্যক্ত হয়েছে। এখানে একদিকে বোয়ার - যুদ্ধ ইংরেজের পাশবহীনতাকে যেমন ঘৃণ্য চোখে তুলে ধরেছেন, তেমনি অন্যদিকে স্বদেশের বিলেতি পণ্যবর্জন ও স্বদেশী পণ্য গ্রহণ সম্পর্কেও তাঁর সুচিন্তিত মত পরিবেশন করেছেন। বোয়ার যুদ্ধের সময় যে মার্শাল ল' জারী হ'য়েছিল সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, — "মার্শাল ল' শব্দের অর্থই প্রয়োজনকালে ন্যায় বিচারের বুদ্ধিকে একটা পরম বিঘ্ন বলিয়া নির্বাসিত করিয়া দিবার বিধি এবং তদুপলক্ষে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানবপ্রকৃতির বাধামুক্ত পাশবিকতাকেই প্রয়োজন সাধনের সর্বপ্রধান সহায় বলিয়া ঘোষণা করা।"[১৮] বিদেশী পণ্যের তুলনায় স্বদেশী পণ্যকে যেকোন উপায়ে এমনকি অন্যায়ের পথেও বড়ো করে তুলতে হবে — এই ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি। তাই এই প্রবন্ধটির মধ্যেই ব্যঙ্গ করে বলেছেন, — "কিন্তু হায়, মনে যদি ভয় থাকে যে, এক মুহূর্তের মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টারের কল যদি বন্ধ করিয়া দিতে না পারি তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য অটল নিষ্ঠার সহিত

১৭। 'যজ্ঞভঙ্গ' — ১৩১৪, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ পৃষ্ঠা ... ৯১৬

১৮। পথ ও পাথেয় — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ - ৯৭৭

বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই, সেইজন্য, এবং কোনোমতে হাতে হাতে পার্টিশনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায়, আমরা পথ - বিপথ বিচার করিতেই চাই নাই।"[১৯] স্বদেশের ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে উতলা করেছে। দেশের বিপদ, দুঃখ যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন কবি। দুঃখ, বিপদকে মুক্ত করবার প্রার্থনা যেমন গীতাঞ্জলিতে পরিস্ফুট তেমনি বিশ্বমানবের পথে যাত্রা করবার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। নিজের জীবনকে বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে, বিশ্বের প্রাঙ্গণেতে পৌঁছে দেবার জন্য কবির প্রার্থনা, —

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।[২০]

বিশ্বমানবতাবোধ ও দেশাত্মবোধ 'গোরা' উপন্যাসে যেমন ব্যক্ত তেমনি 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটি কবিতাতেও সেই বিশ্বপ্রীতিকতার ও মানবমিলনসাধনার সুর উচ্চারিত। যেমন ভারততীর্থ কবিতায়[২১] —

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে —
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।

* *

১৯। পথ ও পাথেয় — রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ পৃষ্ঠা .. ১৮৭

২০। গীতিমাল্য — ২৮ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৩৩৯।

২১। ভারততীর্থ - গীতাঞ্জলি, ১০৬ সংখ্যক কবিতা, (১৮ই আষাঢ়, ১৩১৭), রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ২৮০ - ৮২

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত করো অপনীত
সব অপমানভার।

ভারতীয় সমাজে জাতিতে জাতিতে যে বিভেদ, যে অস্পৃশ্যতাবোধ মনুষ্যত্বের অবমাননাকর, ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে শাসক ও শাসিতের যে সম্পর্ক এই প্রসঙ্গ এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বমানবিকবোধের কথা বললেন রবীন্দ্রনাথ উক্ত কবিতাটিতে। মানুষকেই অন্যায়ভাবে অপমান করবার স্পর্ধা যে জেগেছে মানুষের মধ্যে সেজন্য দেশকেই কবি দুর্ভাগা বলেছেন। অস্পৃশ্যতার প্রসঙ্গটি ধরা পড়েছে এখানে – অর্থাৎ সর্ব মানবিকধারণাই প্রকাশ পেয়েছে –

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
তাই,
বিধাতার রুদ্র রোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।[২২]

****

২২। অপমানিত – গীতাঞ্জলি, ১০৮ সংখ্যক কবিতা, (২০শে আষাঢ়, ১৩১৭), রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ২৮৩

অবহেলিত অধম দীন জনের জন্য কবির সমবেদনা উদ্বেল হ'য়ে ওঠে গীতাঞ্জলির ১০৭ সংখ্যক কবিতাটিতে, –

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব - হারাদের মাঝে ।

0 0 0

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে –
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব - হারাদের মাঝে ।
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি –
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে ।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সনাতন ভারতীয় হিন্দু সমাজের কথা প্রকারান্তরে ধরা পড়লো 'অচলায়তন' (আষাঢ়, ১৩১৮) রূপক নাটকটির মধ্যে । 'অচলায়তন' ভেঙে পড়লো নির্যাতিত ও অস্পৃশ্য - ম্লেচ্ছদের নিয়ে গড়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে । আবার নতুন করে গড়বার আশ্বাস ও প্রচেষ্টাও রয়েছে 'অচলায়তন' রূপক নাটকটির মধ্যে । যা পুরনো, জীর্ণ তাকে ভাঙবার এবং সেখানেই আবার নতুন গড়বার আশ্বাস উৎসাহ একই সঙ্গে দুটো চিন্তাই রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়ে তুলেছে । সাম্প্রদায়িকতার রক্তাক্ত বিদ্বেষের ব্যাপক সংক্রমণ ঘটেছে ইতিমধ্যে । এ সম্পর্কেও ভাবিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । প্রবাসীতে ১৩১৫ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে পরপর দুটি প্রবন্ধ

79054
3 SEP 1982

'সমস্যা'ও 'সদুপায়' লিখে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা সম্পর্কে তাঁর চিন্তার প্রকাশ ঘটালেন। জোর করে মিলনসাধন যেমন হয় না, বয়কটের প্রেরণাও তেমনি জোরের দ্বারা সম্ভব নয়। পল্লীর উন্নয়নমূলক বৃহৎ কর্মযজ্ঞেও ব্যাপৃত হতে দেখা যায় এই সময় রবীন্দ্রনাথকে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে আত্মকলহ ও স্বার্থদ্বন্দ্বের সঙ্কীর্ণ আবর্ত সৃষ্টি হচ্ছিল তার বাইরে আত্মনির্ভর এক পরিপূর্ণ জীবনের আকৃতি জেগে ছিলো কবির মনে। সর্বপ্রকারের ভয় অমঙ্গল ও কলুষ থেকে মুক্তির বাসনায় ব্যাকুল হয়েছিলো তাঁর মন। নৈবেদ্যের কবিতায় সেই আবেগের প্রকাশ ঘটেছিলো। তাই বলে সক্রিয় রাজনীতি থেকে একেবারে দূরে সরে থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। অচিরকালের ব্যবধানে বরিশাল কনফারেন্স ও সত্যপতিরূপে পাবনা কনফারেন্সে তাঁর যোগদানের ঘটনা সেই পরিচয় বহন করে। আবার এই 'নৈবেদ্য'র কবিতাতেই দেশাতীত মানুষের মঙ্গল বাসনার প্রকাশও লক্ষ করা যায়। 'নৈবেদ্য'র কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর কবি যিনি দেশের ও জগতের সকল আন্দোলন আলোচনার সংবাদ রাখিতেন এবং অন্যায়ের জন্য তীব্র বেদনা বোধ করিতেন।' [২৩] ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন। কবির এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে ভারতবাসীর জাতীয় মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বেড়েছে এবং সেই সূত্রে ভারতের জাতীয়মুক্তি-আন্দোলনও নতুন প্রেরণা পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। ইংলণ্ড আমেরিকা ঘুরে ৪ অক্টোবর ১৯১৩, ভারতের পথে ফিরলেন রবীন্দ্রনাথ — বৃহত্তর পৃথিবীর এক বিশিষ্ট অংশে ভ্রমণের নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৭ মে, ইংলণ্ড যাত্রা করেছিলেন কবি। ইংলণ্ড থেকে নিউইয়র্ক এবং অন্যে আমেরিকার নানা জায়গায় কয়েকমাস ধরে ক্রমশ ঘুরলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিত্রকর মনীষী রোটেনস্টাইনের আমন্ত্রণ এবারে কবির ইংলণ্ড যাত্রার বাসনাকে উৎসাহিত করে

২৩। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, ২য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ১৩৫৫, পৃষ্ঠা — ১৫।

তুলেছিলো এবং এই মনীষীর মাধ্যমেই ইংলণ্ডের 'ভাবুক সমাজে'র সঙ্গে পরিচয় হ'লো রবীন্দ্রনাথের। এর আগেও কবি ইংলণ্ডে গেছেন দু'বার। কিন্তু তখন সেখানকার বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তাঁর মিলনের সীমা ছিল সঙ্কুচিত। তিনি তাঁর 'ইউরোপ প্রবাসী'র পত্রেও সে কথা বলেছেন। এই সময়েই কবির ইংরেজী গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি যা রোটেনস্টাইনকে উপহৃত রোটেনস্টাইন তা ইংলণ্ডের হাতে তুলে দিলেন। এই ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' পড়ে মুগ্ধ হলেন ব্র্যাডলে, স্টপফোর্ড ব্রুক, ইয়েটস্ প্রমুখ রসিকজন। আয়র্লণ্ড এবং ভারত একই হ ইংলণ্ড দ্বারা শাসিত আর ইয়েটস্ সেই পরাধীন স্বদেশের কথা বলেছেন – রবীন্দ্রনাথেরও তাই যেন ইয়েট্সের প্রতিই বেশি টান। কেননা কবিও পরাধীন ভারতের কথাই তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়, গানে – তাঁর বক্তব্যে। ওয়েলস্, রাসেল, বার্নার্ড - শ, এরাও তাঁরা রাজনীতি বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ভাবুক সমাজের অনেকেরই চিন্তায় সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা ছিল। এঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা, জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামীর কুফল ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা স্পষ্ট হয়, – এমন অনুমান করা চলে। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাই কবিকে উৎসাহিত করেছে নানাভাবে। পাশ্চাত্যের কাজকর্ম, খেলাধুলো, নিয়মনিষ্ঠা এবং তাদের দেহমনে শক্তি প্রাচুর্য লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছেন কবি। স্টপফোর্ড ব্রুকের সত্তর - উত্তীর্ণ বয়েসেও যে আশ্চর্য নবীনতা লক্ষ করেছিলেন কবি সে সম্পর্কে মুগ্ধ হয়ে একটি চিঠিতে [১৪] লিখেছিলেন, "আমার বারবার মনে হইতে লাগিল, বৃদ্ধের মধ্যে যখন যৌবনকে দেখা যায় তখনই তাহাকে সকলের চেয়ে ভালো করিয়া দেখা যায়। কেননা সেই যৌবনই সত্যকার জিনিস।" ইংলণ্ডের এই ভাবুক সমাজ সম্পর্কে তাঁর ধারণার বিবরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর 'ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজ' প্রবন্ধে :—[১৫]

* *

১৪। বিলাতের চিঠি (স্টপফোর্ড ব্রুক), প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১৯।

১৫। 'ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজ'— পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১১৭ - ১৮।

"এ সমাজ কাহাকেও পিছাইয়া পড়িয়া থাকিতে দিবে না , যে একটু পিছাইয়া পড়িবে তাহাকেই হার মানিতে হইবে । আমাদের দেশের তন্দ্রালস নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নেও আমরা অর্ধেক চোখ বুজিয়া আন্দাজ করিতে পারি — এ দেশের চিন্তার হাটে কী ভয়ংকর কোলাহল এবং ঠেলাঠেলি । কিন্তু , সেই ভিড়ের চাপটা নিজের মনের উপর যখন ঠেলা দেয় তখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি তাহার বেগ কতখানি । এ দেশে যাঁহারা মনের কারবার করেন তাঁহাদের কাছে আসিলে সেই বেগটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না ।" ইউরোপের আত্মার শক্তি , তাদের নবীন প্রাণ , যৌবন যা নতুনতর পরীক্ষা ও পরিবর্তনের পথে ইউরোপকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, রবীন্দ্রনাথ তাতে উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছেন । কেননা, রবীন্দ্রনাথও জন্মেছিলেন আজীবন মানসিক যৌবনের অধিকার নিয়েই ।

পশ্চিমের দেশ, সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ । পশ্চিমের চিন্তাজগতের সঙ্গে, সে দেশের ভাবুক সমাজের সঙ্গে যেমন তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ঘটে তেমনি অন্যদিকে সংকীর্ণ জাতিপ্রেম বা ন্যাশানালিজমের স্বার্থদ্বন্দ্ব আসন্ন সংঘাতের ছায়াপাতও তাঁর নজর গোচর হয় । নোবেল পুরস্কারে ভূষিত কবি আর কেবল বাংলার কবি নন , তিনি বিশ্ব কবিরূপে বন্দিত হতে থাকেন । বিশ্বাত্মবোধের অস্তিত্ব তাঁর চেতনায় পূর্বাবধি দেখা গেলেও এখন তিনি বিশেষ অর্থেই বিশ্বনাগরিক । তাঁর চিন্তায় চেতনায় এবং তার প্রকাশে এই নতুন তরঙ্গের দোলা স্বাভাবিকভাবেই অতঃপর প্রকটিত হতে থাকবে । দেশের অভ্যন্তরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাতেও ইতিমধ্যে গুরুতর পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটেছে । বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের আন্দোলনের জোয়ার স্তিমিত । স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সর্বশ্রেণীর মানুষের 'চিত্তক্ষেত্রে এক নবভাবের প্লাবন' জেগেছিলো , কর্মোদ্দীপনার ভেতর দিয়ে নিরুদ্ধ আবেগাদর্শের প্রকাশের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেশের যৌবনশক্তির সামনে দেখা দিয়েছিলো বঙ্গভঙ্গ রহিত (ডিসেম্বর, ১৯১১) হওয়ার পর তা সহসা স্তব্ধ হয়ে পড়ে । "বাংলাদেশে একদিন স্বদেশ প্রেমের বান ডাকিল , আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভবরকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি । সেদিন

সমাজটাও যেন আপাদমস্তক নড়িয়া উঠিল এমনতরো বোধ হইয়াছিল । ... সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে । সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধিবোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে ।" 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এসব কথা লিখলেন । স্বদেশের পরিস্থিতির মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় জীবনের কর্মচাঞ্চল্য ও পরিবেশের সদ্য অভিজ্ঞতার প্রতিকৃতিটি প্রস্তুত ছিলো কবির সামনে । তাই তিনি জোর দিয়ে বললেন, "দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না । তারুণ্যের জয় হউক ... ।" 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিলো সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩২১) ।

"ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করেছি । এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ হতেই আমাদের নবসাহিত্যের সৃষ্টি ।" সবুজপত্রের উদ্দেশ্য যে "বাঙালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ" করা সবুজপত্রের মুখবন্ধে তা এইভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিলো । বাইরের বিশ্বকে প্রাণছন্দে মুগ্ধ করিয়েও বাঙালীদের বনিয়াদের ওপরে জীবনের নতুন ইমারত গড়তে চেয়েছিলো সবুজপত্র । 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' ছাড়া 'হালদার গোষ্ঠী' গল্প এবং 'সবুজের অভিযান' কবিতা — রবীন্দ্রনাথের এই রচনাত্রয়ী সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হ'লো । রবীন্দ্রনাথের লেখার ধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিল । গদ্যে মৌখিক ভাষার সর্বাঙ্গীন প্রয়োগ সূচিত হলো । বুদ্ধিবাদ যেহেতু সবুজপত্রের অন্যতম আদর্শ রবীন্দ্রনাথের রচনাকেও তা স্পর্শ করেছে । 'সবুজের অভিযান' হইতে রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যে একটি নূতন সুরের পালা শুরু হইল ।'[১৫]

* *

১৫। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড বিশ্বভারতী, ১৩৫৫, পৃষ্ঠা - ৩৫১ ।

কবিতায় মানবধর্মের প্রকাশ সম্ভবত এই নূতন সুরের অন্যতম উল্লেখনীয় দিক । বাইরের বিশ্বকে প্রাণভরে স্বাগত জানানোতে সবুজপত্রে যেমন আন্তর্জাতিকতার স্পর্শ এসে লেগেছে বিশ্ব-নাগরিক রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় মননে তেমনি দেশের দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বের ও বিশ্বমানবের স্থান প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে । অর্থাৎ পালা বদলের দিন শুরু হ'য়ে গেছে । অন্যদিকে দেশীয় রাজনীতিতেও দেখা যায় এই সময় থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে । রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা দেশের সীমা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছে এই সময়ে । সানফ্রান্সিসকোতে 'গদর' আন্দোলনের সূত্রপাত এবং জাপান , সাংহাই , হংকং আর পরে ভারতে এই আন্দোলনের প্রসার , 'কামাগাটামারু জাহাজ প্রবেশের চেষ্টা ও প্রত্যাবর্তন , জার্মাণ সরকারের সহায়তায় জার্মানীতে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি' গঠন প্রভৃতি ঘটনা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সূত্রের পরিচয়বাহী । প্রথম মহাযুদ্ধ ভারতের বুকে অনুষ্ঠিত না হ'লেও এ যুদ্ধ বিশ্ব যুদ্ধরূপেই দেখা দিয়েছিলো । যুদ্ধের প্রভাব ইংরেজ শাসিত ভারতীয় জীবনের ওপর পরোক্ষভাবে হ'লেও গভীররেখায় অঙ্কিত হয় । অর্থনীতির ক্ষেত্রে যুদ্ধের অভিঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধের ওপর তীব্র আঘাত ভারতীয় জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে । যুদ্ধে ইংরেজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা বা অসহযোগিতার প্রশ্ন কংগ্রেসকে ভাবিত করে এবং যুদ্ধশান্তি ঘটলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির শর্তে যুদ্ধে ইংরেজের সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় । ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাব আসন্ন হ'য়ে ওঠে । এন্ড্রুজ , পিয়ার্সন ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দেন । এইসব নানাদিক থেকে ভারতীয় জীবনে দিন বদলের সূচনা ঘটে — প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনাপর্বে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালে আর একবার এই পরিস্থিতি ও পরিবেশের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় ।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর প্রবন্ধ নাটকে , গল্প উপন্যাসে , কবিতায় সমকালের রাষ্ট্র রাজনীতি , সমাজধর্ম , শিক্ষাসংস্কৃতি প্রভৃতি জীবনের বিচিত্র প্রসঙ্গের অভিপ্রকাশ ঘটেছে দেখেছি । তা একভাবে ঘটেছে । প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা সময় থেকে যে গুরুতর পরিবর্তনের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথের চেতনায় তার ছায়া আঁকা হয়ে যায় ।

এন্ড্রুজকে লেখেন , –

' I have been experiencing the feeling of a great expectation, although it has also its elements of very great suffering, To be born naked in the heart of the eternal truth; to be able to feel with my entire being the life throb of the universal heart that is the cry of my soul . . . I tell you all this, so that you understand what I am passing through . . . '

মহৎ আশা আর গভীর যন্ত্রণা – সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো – বিশ্বজীবনের সঙ্গে যোগের ধ্যান যুগসূচনায় রবীন্দ্রমানসের এই ছিল আকূতি । অতঃপর সময়ের হাত ধরে জীবনে ও সমাজে যে পরিবর্তন দেখা দেয় রবীন্দ্ররচনায় তা কীভাবে ধরা পড়ে , বিশেষতঃ তাঁর কবিতায় সমাজ সম্পর্কের যে ধারাপ্রবাহ – তাই এঁকে দেখানোর প্রয়াস অতঃপর ।

****

২৭। Letters to afriend, 17th May,1914.